অনুবাদ সমগ্র

১ম খন্ড

মোহাম্মদ শাহজাহান

অনুবাদ সমগ্র

১ম খন্ড

মোহাম্মদ শাহজাহান

ভূমিকা

শুরুতেই সেই মহান আল্লাহ’র শোকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে এই গ্রন্থের ছোটগল্পগুলো বাংলায় ভাষান্তর করে প্রিয় পাঠকদের হাতে তুলে দেবার সুযোগ করে দিয়েছেন।

সাহিত্যের প্রতি আমার অনুরাগ আজন্ম। বিশেষতঃ ছোটগল্প আমাকে টানে বেশি। এ কারণে গত দু’যুগ ধরে বাংলা ছোটগল্প ছাড়িয়ে বিশ্ব সাহিত্যের ছোটগল্পে বুঁদ হয়ে আছি। নিজে উপভোগ করার পাশাপাশি আগ্রহী অন্যরাও যেনো এর স্বাদ নিতে পারেন, সেটি বিস্মৃত হইনি। এ উপলব্ধি থেকে পেশাগত কর্ম ব্যস্ততার কারণে খুব নিয়মিত না হলেও অনিয়মিত পরিশ্রমে ছোটগল্পের অনুবাদ করে চলেছি। আর অনুদিত গল্পগুলোর সবই প্রকাশিত হয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও অনলাইন পোর্টালে ছড়িয়ে আছে। এগুলোর সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। শতাধিক তো হবেই।

মনে পড়ে, রাশিয়ান ছোটগল্পের অনুবাদের মাধ্যমে হাতেখড়ি অনুবাদের। পরে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার ছোটগল্পের অনুবাদ করেছি। আরও পরে আরবী ছোটগল্প অনুবাদ করে আনন্দ পেয়েছি।

বিশ্বব্যাপী অতিমারির কারণে অখন্ড ফুরসত মিলেছে। আমিও ব্যতিক্রম নই এর। ফলে এই ফুরসতকে কাজে লাগিয়ে পুরনো লেখাগুলো আবার পড়ছি; স্মৃতি-কাতর হচ্ছি। সাথে এগুলোকে ই-বুক আকারে অন্তর্জালে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

দশটি অনুদিত গল্প নিয়ে আমার অনুবাদ সমগ্রের ১ম খন্ড প্রিয় পাঠকদের কাছে তুলে দিলাম।

ধন্যবাদ।

সূচীপত্র

বাঘ

জাকারিয়া তামির

[জাকারিয়া তামির। সিরীয় ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার। জন্ম ১৯৩১ সালে। সিরিয়ার আল-বাশা শহরে। আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যের জীবন্ত কিংবদন্তী। স্বৈরশাসন-বিরোধী বুদ্ধিজীবী। শিশুতোষ রুপকথার আড়ালে প্রচন্ড রাজনীতি-সচেতন লেখক তিনি। এখানে মূল আরবী থেকে 'টাইগারস অন দি টেন্থ ডে' শিরোনামে ইংরেজিতে অনুদিত তাঁর ছোটগল্পটির বাংলা অনুবাদ পত্রস্থ করা হলো।]

খাঁচা-বন্দি বাঘটি বন্য জীবনকে ভুলতে পারে না।

খাঁচার বাইরের মানুষগুলোকে ঘৃণা-ভরা চোখে দেখে সে। নির্ভয় লোকগুলো আগ্রহভরে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। এদের মধ্যে একজন শান্ত, কর্তৃত্বপূর্ণ কন্ঠে বলে:

- তোমরা যদি সত্যি সত্যি আমার কাজটি শিখতে চাও অর্থাৎ পশু পোষ-মানানো বিদ্যা রপ্ত করতে চাও, তাহলে এক মূহুর্তের জন্যেও ভুলো না যে, পশুটির পেটই তোমাদের প্রধান লক্ষ্য। দেখবে, এই পেশাটি একই সঙ্গে সহজ, আবার কঠিনও। এই বাঘটিকেই দেখো না; বেশ হিংস্র, বেয়াড়া, স্বাধীনচেতা আর শক্তিশালী, তাই না? কিন্তু সে বদলে যাবে- দুর্বল, ভদ্র আর বিনয়ী হয়ে উঠবে- ঠিক শিশুদের মতো। যার হাতে খাবার আছে আর যার হাতে তা নেই- এদের দুজনের মধ্যে কী ঘটে দেখো, শিখে নাও।

অন্য লোকগুলো পোষ-মানানো বিদ্যার প্রতি তাদের আন্তরিকতা প্রকাশ করতে ছুটে আসে। পোষ-মানানো বিদ্যার প্রশিক্ষক খুশি হয়। সে বাঘটিকে লক্ষ্য করে রসিকতাপূর্ণ কন্ঠে বলে:

- তো, কেমন আছে আমাদের সম্মানিত অতিথি?

- আমার খাবার প্রস্তুত করো; আমার খাওয়ার সময় এখন। বাঘটি বলে।

- আমার হাতে বন্দী হয়ে আমাকেই নির্দেশ দিচ্ছিস, তুই? খুব মজার বাঘ তো, তুই? তোর তো এটা বুঝা উচিত যে, এখানে আদেশ-নির্দেশ দেবার মালিক একমাত্র আমিই। প্রশিক্ষক কৃত্রিম বিস্ময়ে বলে।

- বাঘদের কেউ নির্দেশ দিতে পারে না।

- কিন্তু তুই তো বাঘ নস আর। বনে তুই বাঘ, কিন্তু এখানে তো খাঁচা-বন্দী তুই। এখন তুই আমার আদেশ-নির্দেশ-মানা অধীনস্থ দাসানুদাস ছাড়া কিচ্ছু না।

- আমি কারও দাস না।

-আমার নির্দেশ মানতেই হবে তোর। কারণ, এই দেখ, তোর খাবারটা আমার হাতেই কিন্তু।

- আমি তোমার খাবার চাই না।

- তোর যা ইচ্ছে। না খেয়েই থাক, তাহলে। তোর ইচ্ছের বিরুদ্ধে তোকে কিছু করতে বাধ্য করতে চাইছি না। প্রশিক্ষক বলে।

এরপর প্রশিক্ষণার্থীদের দিকে তাকিয়ে সে বলে:

- দেখবে কী করে সে মত বদলায়। কেবল মাথা উঁচু করে থাকলেই তো পেট ভরবে না আর।

বাঘটি না খেয়ে থাকে। বনে বাতাসের বেগে ধেয়ে গিয়ে শিকারের উপর হামলে পড়ার স্মৃতি মনে পড়ে যায় তার। মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে।

পরদিন প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীরা খাঁচার কাছে এসে জড়ো হয় আবারও।

- তোর কি ক্ষিদে পায়নি? নিশ্চয় পেয়েছে, কী বলিস? খুব কষ্ট হচ্ছে তো? একবার শুধু বল, তুই ক্ষুধার্ত। তারপর যতো পারিস, মাংস খা। প্রশিক্ষক বলে।

বাঘটি চুপ করে থাকে।

- আমার কথা শোন। বোকামি করিস না। শুধু এটা স্বীকার করে নে যে, ক্ষিদে পেয়েছে তোর। সাথে সাথে খেতে দেবো তোকে। প্রশিক্ষক আবারও বলে।

- আমি ক্ষুধার্ত। বাঘটি বলে।

প্রশিক্ষক হেসে উঠে। সে প্রশিক্ষণার্থীদের বলে:

- এখন সে এমন এক ফাঁদে পা দিয়েছে যা থেকে আর কখনও বেরুতে পারবে না।

সে বাঘটিকে খাবার দিতে বলে। ফলে প্রচুর মাংস খেতে দেয়া হয় বাঘটিকে।

তৃতীয় দিন প্রশিক্ষক বাঘটিকে বলে:

- যদি খেতে চাস তো, আমার কথামতো কাজ কর।

- আমি মানবো না তোমার কথা। বাঘটি বলে।

- অতো তাড়াতাড়ি 'না' বলিস না। আমার অনুরোধটা তো খুব ছোট। তুই এখন খাঁচার ভেতর পায়চারি করছিস। আমি যখন বলবো 'থাম', তুই থেমে পড়বি।

- এটা তো ছোট একটা অনুরোধ; এভাবে নাছোড়বান্দার মতো গোঁ ধরে না খেয়ে থেকে লাভ কি খামাখা? বাঘটি মনে মনে ভাবে।

- থাম! প্রশিক্ষক কর্কশ কন্ঠে উচ্চ স্বরে নির্দেশ দেয়।

বাঘটি তৎক্ষণাৎ থেমে পড়ে।

- এই তো, এই তো চাই। বন্ধুত্বপূর্ণ কন্ঠে বলে প্রশিক্ষক।

বাঘটিও পেটপুরে খেতে পেয়ে খুশি হয়।

- দিন কয়েকের মধ্যেই বেটা কাগুজে বাঘ হয়ে উঠবে। প্রশিক্ষণার্থীদে র উদ্দেশ্য করে বলে প্রশিক্ষক।

চতুর্থ দিনে বাঘটি প্রশিক্ষককে বলে:

- আমি ক্ষুধার্ত- আমাকে থামতে বলো।

- দেখো, সে আমার নির্দেশ মানতে শুরু করেছে। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের বলে।

এরপর সে বাঘটির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে:

- বিড়াল ছানার মতো মিও মিও করে না ডাকলে আজ কোন খাবার পাবি না তুই।

- বিড়াল ছানার মতো মিও মিও ডাকতে ভারি মজাই লাগবে। রাগ সংবরণ করে মনে মনে বলে বাঘটি। এরপর সে মিও মিও ডাকার চেষ্টা করে।

- জঘন্য! নাকে গরগর শব্দ করলেই কি মিও ডাক হয়? বেজার কন্ঠে বলে প্রশিক্ষক।

বাঘটি আবারও চেষ্টা করে। কিন্তু প্রশিক্ষক খুশি হতে পারে না।

- চুপ কর! তোর মিও ডাকটি এখনও জঘন্য। মিও ডাক শেখার জন্যে একদিন সময় দিচ্ছি। আগামীকাল তোর পরীক্ষা নেবো। পাস করলে খেতে পাবি, না হলে পাবি না।

প্রশিক্ষক ধীর পায়ে প্রস্থান করে সেখান থেকে। প্রশিক্ষণার্থীরাও তার পেছন পেছন চলে যায়। বাঘটি অবাধ বন্য জীবনের কথা ভেবে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। কিন্তু তার করুণ আর্তি অনেক দূরের সেই বনে গিয়ে পৌঁছোয় না।

পঞ্চম দিনে প্রশিক্ষক বাঘটিকে বলে:

- বিড়াল ছানার মতো ডাকতে পারলে তাজা মাংসের একটা বড় টুকরো খেতে পাবি।

বাঘটি মিও মিও করে ডেকে উঠে। প্রশিক্ষক খুশিতে হাততালি দিয়ে বলে:

- চমৎকার! এই তো, বিড়ালের মতো সুন্দর ডাকছিস। প্রশিক্ষক বাঘটির দিকে মাংসের বড় একটি টুকরো ছুঁড়ে দেয়।

ষষ্ঠ দিনে প্রশিক্ষক খাঁচার কাছে যেতে না যেতেই বাঘটি বিড়ালের মতো ডেকে উঠে। কিন্তু প্রশিক্ষক খুশি হতে পারে না।

- কিন্তু আমি তো বিড়ালের মতোই ডেকেছি। বাঘটি বলে।

- গাধার মতো করে ডাক। প্রশিক্ষক নির্দেশ দেয়।

- আমি তো একটা বাঘ। বনের পশুরা আমাকে ভয় পায়। গাধার মতো ডাকবো? আমি বরং মরে যাবো। ক্ষুব্ধ কন্ঠে বলে বাঘটি।

প্রশিক্ষক কিছু না বলে নীরবে প্রস্থান করে।

সপ্তম দিনে প্রশিক্ষক হাসি হাসি মুখে খাঁচার পাশে এসে হাজির হয়:

- খেতে চাসনে তুই?

- হ্যাঁ, চাই। বাঘটি বলে।

- তুই যে মাংসটা খাবি তার তো একটা দাম আছে। গাধার মতো ডাক, খেতে পাবি। প্রশিক্ষক বলে।

বনের মুক্ত জীবনের কথা স্মরণ করতে চেষ্টা করে বাঘটি। কিন্তু পারে না। সে চোখ দুটো বন্ধ করে গাধার মতো ডাকতে চেষ্টা করে।

- তোর গাধার ডাকটা ভালো হচ্ছে না। কিন্তু দয়া করে এক টুকরো মাংস খেতে দিচ্ছি তোকে।

অষ্টম দিনে প্রশিক্ষক বলে:

- আমি একটা বক্তৃতার শুরুর অংশটা বলবো। আমি শেষ করার সাথে সাথে তুই এমনভাবে হাততালি দিবি যেনো বক্তৃতাটা খুব পছন্দ হয়েছে তোর।

- ঠিক আছে, তা-ই হবে। বাঘটি বলে।

প্রশিক্ষক বক্তৃতা শুরু করে:

- নাগরিকগণ-----আমাদের এখনকার মূল লক্ষ্যটি আপনাদের নিকট বহুবার ব্যাখ্যা করেছি। আমাদের শত্রুদের ষড়যন্ত্র যতোই শক্তিশালী হোক না কেনো, আমরা ঈমানের সাথে যুদ্ধ করে সকল ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে বিজয়ী হবোই।

- আমি তোমার বক্তৃতাটা বুঝিনি। বাঘটি বলে।

- আমি যা কিছু বলি তার সবই পছন্দ করা তোর জন্যে আবশ্যক। আর স্যোৎসাহে হাততালিও দিবি।

- আমাকে ক্ষমা করো।আমি মূর্খ। তোমার বক্তৃতাটি দারুণ! আমি তোমার ইচ্ছেমতোই হাততালি দেবো। বাঘটি হাততালি দিতে শুরু করে।

- আমি দু' মুখোদের পছন্দ করি না। আজ না খেয়ে থাকবি তুই- এটিই তোর শাস্তি।

নবম দিনে প্রশিক্ষক কিছু খড় নিয়ে এসে হাজির হয়। খড়টুকু সে বাঘটির দিকে ছুঁড়ে দেয়।

- খা। প্রশিক্ষক বলে।

- এটা কী? আমি তো মাংসাশী। বাঘটি বলে।

- আজ থেকে খড় ছাড়া আর কিচ্ছু খেতে পাবি না।

বাঘটির ক্ষিদে বাড়তে থাকে। সে খড়টুকু খেতে চেষ্টা করে। খড়ের বিদঘুটে স্বাদে তার গা গুলিয়ে উঠে। কিন্তু সে আবারও চেষ্টা করে। ধীরে ধীরে খড় খেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে বাঘটি।

দশম দিনে প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থীরা, বাঘটি ও তার খাঁচাটি উধাও হয়ে যায়। বাঘটি একজন নাগরিকে ও খাঁচাটি একটি নগরীতে রুপান্তরিত হয়।

অপেক্ষা

সন্তি কৃষ্ণমূর্তি

[সন্তি কৃষ্ণমূর্তি ভারতীয় কথা-সাহিত্যিক। তেলুগু ভাষার খ্যাতিমান লেখক তিনি। এখানে অনুদিত তাঁর ছোটগল্পটিতে ভারতীয় তথা উপমহাদেশের নির্বাচন-ব্যবস্থায় কালো টাকার ছড়াছড়ির বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে।]

- আমার জন্যে কিছু এসেছে?

সে জিজ্ঞেস করে। প্রশ্নটিতে দ্বিধা, লজ্জা,হতাশা ও আশার প্রতিধ্বনি টের পায় চন্দ্রকুমার।

- না। চন্দ্রকুমার বলে।

হতাশ মনে ফিরতি পথ ধরে সে। চন্দ্রকুমার বিস্মিতনেত্রে তাকায় তার দিকে।

সে যে ঠিক কীসের জন্যে অধীর অপেক্ষায় আছে, চন্দ্রকুমার ভেবে পায় না। চন্দ্রকুমার পোষ্টমাস্টার হয়ে এই গ্রামে এসেছে দু'মাস আগে। এর মধ্যে প্রতিদিন ডাকঘরে এসে একই প্রশ্ন করে করে হতাশ মনে ফিরে গেছে সে। ব্যাপারটিতে অবাক হয় চন্দ্রকুমার।

শাখা ডাকঘর হওয়ায় কোন ডাক পিয়ন নেই এখানে। ফলে চিঠিপত্র বাছাই ও বিলি- চন্দ্রকুমারকেই করতে হয় সবকিছু। তবে গ্রামের লোকজন ডাকঘরে এসেই চিঠিপত্র নিয়ে যান বলে খুব একটা বেগ পেতে হয় না তার। অবশ্য, কালেভদ্রে দুয়েকটি চিঠি রয়ে গেলে সেগুলো সুবিধাজনক সময়ে নিজে গিয়ে বিলি করে আসে সে। তাছাড়া, মাঝেমধ্যে চিঠিপত্র পড়ে শুনিয়ে, ব্যাখ্যা করে কিংবা লিখে দিয়েও গ্রামবাসীদের সাহায্য করে সে। গ্রামের লোকজনকে সাধ্যমতো সাহায্য-সহযোগিতা করে সে। নির্দ্বিধায়। প্রত্যেকের মন যুগিয়ে কথা বলতে জানে সে। খবরের কাগজ পড়ে গ্রামবাসীদের নিকট ব্যাখ্যা করাও নিত্যদিনের সান্ধ্যকালীন কাজ তার। অন্য সময় চুপচাপ থাকতেই ভালোবাসে সে। পোষ্টমাস্টার পদে চাকুরি করে পনেরো রুপি মাইনে পায়। একজন ডাক হরকরার মাইনেও পোষ্টমাস্টারের চেয়ে বেশি। তবু চাকুরিটা চন্দ্রকুমারের পছন্দই বলতে হবে।

সে চলে যাবার পর ওই দিনের ডাকে আসা পত্রিকাটি পড়ার জন্যে হাতে তুলে নেয় চন্দ্রকুমার। কিন্তু বারবার মহিলাটার কথা মনে পড়ছে বলে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পারে না।

সে প্রতিদিন একই সময়ে এসে জানতে চায়:

-আমার জন্যে কিছু এসেছে----?

-না। চন্দ্রকুমারও প্রতিদিন জবাবে বলেন। না-সূচক উত্তর পেয়ে সেও প্রস্থান করে। হায়! এমন কী আছে যার জন্যে এভাবে অপেক্ষা করে চলেছে সে? কিছুই ভেবে পায় না চন্দ্রকুমার। কিন্তু কোন সদুত্তর খুঁজে পায় না।

অবশ্য,কখনও তার কাছে জানতে চায়নি সে। কারণ, মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জিত অনুভব করে সে; এমনকি দ্বিধাগ্রস্থও বোধ করে। ভয়ও লাগে। মারধরের বা গালিগালাজের শিকার হবার ভয় নয়। বরং অকারণেই ভয় লাগে তার।

সে বয়সে তার চেয়ে খানিকটা বড় হবে। দেখতেও সুন্দরী। কেমন যেনো অদ্ভূদ এক ভালো লাগা ঘিরে আছে তাকে। তবে "দীর্ঘ অপেক্ষা"র বিষয়টিই অবাক করে চন্দ্রকুমারকে। দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবার সময় বিদায়ী পোষ্টমাস্টার তাকে ওর ব্যাপারে জানিয়েছিলেন: সে দৈনিক আসে আর একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। তিনি এর পেছনকার কারণটা অবশ্য বলে যাননি।

হায়! ওর স্বামী কি প্রবাসে থাকে? কিংবা সেনাবাহিনীতে চাকুরিরত? সে কি স্বামীর প্রেমময় চিঠির জন্যে অপেক্ষমান? তা-ই সত্যি হতে পারে,চন্দ্রকুমার অনুভব করে। নারীরা মানুষ হিসেবে ভালো। হৃদয়ের দিক থেকে তারা উত্তম। তাদের হৃদয় ভালোবাসায় কানায় কানায় পূর্ন থাকে। পুরুষেরাই বরং মন্দ। হৃদয় বলতে কিছু নেই তাদের। নারীর প্রতি ঘেন্না পোষণ করে তারা। নারীর উপর অত্যাচার চালায়। স্বামী ওর কাছে প্রেমময় চিঠিপত্র না লিখে থাকতে পারছে কী করে? সে কি খারাপ মানুষ একজন? স্ত্রীর জন্যে কি ভালোবাসা বলতে কিছু নেই তার? আগামীকাল জিজ্ঞেস করে নেবো ওকে। সত্যিটা জেনে নেবো। সাধ্যমতো সাহায্য করবো ওকে। চন্দ্রকুমার ভাবতে থাকে।

পরদিন সে আসে। বরাবরের মতো জিজ্ঞেস করে:

- আমার জন্যে কি কিছু এসেছে----?

- না, কিন্তু----। চন্দ্রকুমার বলে।

ডাগর চোখে তাকায় সে। চোখের ভাষায় সে যেনো বলে:

- বলুন---?

- মাফ করবেন---একটি প্রশ্ন----আশা করছি, মাফ করবেন আমাকে। একটি প্রশ্ন করতে চাইছি। অন্যভাবে নেবেন না। আপনি প্রতিদিন এখানে আসছেন।দয়া করে বলবেন কি--- এই দীর্ঘ অপেক্ষা কীসের জন্যে? চন্দ্রকুমার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

- আরে, তেমন কিছু না----দুই বছর আগে এক নির্বাচনে ভোট দিয়েছিলাম। ওরা বিনিময়ে আমার জন্যে মানি অর্ডারে কিছু টাকা পাঠাবে বলেছিলো, এজন্যেই প্রতিদিন এখানে আসা আর কি।

চন্দ্রকুমার যেনো আকাশ থেকে পড়ে।

স্মৃতিসৌধ

সি.আয়াপ্পন

[সি. আয়াপ্পন ভারতের মালয়ালম ভাষার অনন্য প্রতিভাধর কথাশিল্পী। দলিত সম্প্রদায়ের পক্ষে ও মুখোশ-ধারী অত্যাচারী শাসককূলের বিরুদ্ধে মসি-যুদ্ধ চালিয়েছেন আজীবন। ১৯৪৯ সালে জন্ম। মৃত্যু ২০১১ সালে। এখানে তাঁর মূল মালয়ালম থেকে 'দি মেমোরিয়াল' শিরোনামে ইংরেজিতে অনুদিত ছোটগল্পটির বাংলা অনুবাদ পত্রস্থ করা হলো।]

ওই ঘটনাটির কথা মনে পড়লে আমরা আজও হাসি আর ক্রোধ সামলাতে পারি না। আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত ঘটে-চলা রাজনৈতিক প্রতারণারই একটি ছিলো ঘটনাটি। আমাদের এলাকায় তিন রাস্তার মোড়ে স্থাপিত গান্ধীর ভাষ্কর্যটিই ছিলো সেই প্রতারণার মূল কারণ। সত্যি বলতে কি, ভাষ্কর্যটি নয়, বরং গুটি কয়েক কাকই সমস্যাটি তৈরি করেছিলো। দেশপ্রেমহীন এই কাকগুলো গান্ধীজির ন্যাড়া মাথায় হাগু করে দিয়েছিলো। এই ঘটনাটিকে ঘিরেই সমস্যার ডালপালা বিস্তার শুরু করেছিলো।

আমরা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরস্পর-বিরোধী দুটি উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়লাম। প্রথম উপদল বললো, কাকের গু থেকে জাতির জনকের মাথা রক্ষার্থে কাউকে নিয়োগের দাবীতে তাৎক্ষণিক একটি নতুন আন্দোলন অবশ্যই শুরু করতে হবে। দ্বিতীয় উপদলের মতে, গান্ধীর ভাষ্কর্যটি বরং টেনে নামিয়ে ভেঙ্গে-চুরে অবশ্যই গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করতে হবে-কারণ, গান্ধীকে ভাষ্কর্যে নয়, বরং পরম ভক্তিতে মনের গভীরেই লালন করতে হবে। কাকেরা তো কারও মনের উপর হাগু করতে পারে না আর, তাই না?

আমরা এ নিয়ে বিতর্কে মশগুল থাকাকালেই পূর্বদিক থেকে ক'জন সপ্রতিভ তরুণ এলো। ওদের কথাবার্তা শুনে হেসে ফেললাম আমরা। আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলেই ফেললো, " আসল রাজনীতিকেরা এসে পড়লো বলে! " আমাদের দুই উপদলকে নিজেদের দলে ভেড়ানোর জন্যে ওরা কী বললো, জানেন?বলছি, দাঁড়ান। তারা যা বললো, তার সারমর্ম এই: গান্ধীর ভাষ্কর্যটিকে আরও একশ' বছর ধরে এভাবে অবশ্যই দন্ডায়মান থাকতে দিতে হবে। আবার হাগু-করা কাকগুলোকেও তাড়ানো যাবে না।অতীতকে তার প্রতিশোধ নিতে দিতে হবে। কাকেরা যে আসলে মৃতদের আত্মা তা তো আমরা জানিই।

ঘুম

মাসুদ মুফতি

[মাসুদ মুফতি। জন্ম পাকিস্তানে। পেশায় সরকারী চাকুরিজীবী ও নেশায় লেখক ।একাত্তরে তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টা তিনি ঢাকায় কাটিয়েছেন।মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর রয়েছে একটি গল্প-সংকলন। এখানে পত্রস্থ তাঁর অনুদিত গল্পটি মূল উর্দু থেকে “Sleep” শিরোনামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন অনুবাদক দুরদানা সুমরো। এই গল্পে নিরস্ত্র বাঙ্গালীর উপর পাকিস্তানী হায়েনাদের অকথ্য অত্যাচার-নির্যাতনের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।]

সময়টা একাত্তরের মার্চ মাস। ঢাকা তখন ধীরে জ্বলা অনির্বাণ অগ্নিশিখার উপর রাখা কেতলির পানির উর্ধ্বমূখী বিস্ফোরণ-উন্মুখ বুদবুদের মতো সশব্দে ফুটছে।

ঠিক ওই বুদবুদের মতো ঢাকার তরুণেরা, বিশেষ করে ছাত্ররা, ওই দিনগুলোতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে ঢাকা শহরের এক বাড়িতে থাকেন এক পশ্চিম পাকিস্তানী। তরুণেরা ঠিক করে, তারা ওই পাকিস্তানীকে একটা উচিত শিক্ষা দেবে। তিনি যে কোন অপরাধ করেছেন, এমন নয়।। বরং পশ্চিম পাকিস্তানী হবার জন্যেই তিনি শাস্তিটা পাবেন। তারা জরুরী বৈঠকে বসে একটা পরিকল্পনা দাঁড় করায়।

রাত সাড়ে দশটার দিকে লোকটি ঘুমুনোর প্রস্তুতি নেন। এমন সময় বিশ-পঁচিশ জন তরুণের একটি দল তাঁর বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে জয় বাংলা,জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগান দিতে শুরু করে।

শ্লোগান চলতে থাকে। লোকটি অপেক্ষা করেন। ভাবেন, ছেলেগুলো চলে গেলে তিনি ঘুমুতে যাবেন।ওদের প্রস্থানের সাথে সাথে তিনি শুয়ে পড়েন। এক ঘন্টা পর আরেক দল তরুণ এসে পৌঁছে এবং মিনিট পনেরো ধরে একই শ্লোগান আওড়াতে থাকে। লোকটি ঘুমুতে না পেরে বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে থাকেন। ওরা চলে যাবার পরে তিনি আবারও ঘুমুনোর প্রস্তুতি নেন। তাঁর চোখে ঘুম আসি আসি করছে, এমন সময়

তরুণদের তৃতীয় দলটি এসে পৌঁছায়---- এক ঘন্টা পরে চতুর্থ দল--- দুই ঘন্টা পরে পঞ্চম দল--- ওরা দলে দলে আসতেই থাকে আর ফলে তিনি নির্ঘুম রাত কাটাতে বাধ্য হন।

এর পরের রাতেও একই ঘটনা ঘটে। অবশ্য, এবারে দরোজার কড়া নাড়াও যুক্ত হয়। এভাবে তৃতীয় রাত আসতে আসতে তার চোখ জোড়া ফুলে উঠে, চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে আর মাথা ঘুরে পড়ে যাবার উপক্রম হয়। আবারও শ্লোগান শুরু হলে তিনি ঘরের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে কারণ জানতে চান। তরুণেরা সোজা-সাপ্টা জানায়- জয় বাংলা বলো, আমরা চলে যাব।

লোকটিও কম যান না। তিনিও সরাসরি জানান, কিছুতেই জয় বাংলা বলবেন না। মৃদুকন্ঠে দুয়েকটা গালিও যোগ করেন। ফলে তরুণেরা আবারও জোরে জোরে শ্লোগান দিতে শুরু করে।

তরুণেরা সারা রাত ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এসে শ্লোগান দিতে থাকে। তাদের একটাই কথা- জয় বাংলা বলো, আমরা চলে যাই।

কিন্তু লোকটি নাছোড়বান্দা। তিনি কিছুতেই জয় বাংলা বলবেন না। চতুর্থ রাতও তাঁর এভাবেই কেটে যায়। তরুণেরাও শ্লোগান আর দরোজার কড়া নাড়া সমানে চালিয়ে যায়। লোকটি পুলিশে অভিযোগ দেন, কিন্তু কোন কাজ হয় না। পঞ্চম রাতে এসে তাঁর মনে হলো, কিছুতেই আর নির্ঘুম রাত কাটাতে পারবেন না। জানালার বাইরে মুখ বের করে তিনি সশব্দে জয় বাংলা বলে উঠেন।

তরুণের দলটি হাত তালিতে ফেটে পড়ে এবং স্থান ত্যাগ করে। লোকটিও ঘুমিয়ে পড়েন। অবশ্য, তরুণদের অন্যান্য দলগুলোর অজানা রয়ে যায় যে, তিনি অবশেষে আত্বসমর্পণ করেছেন। ফলে তারা যথারীতি আসতেই থাকে আর একই দাবী জানাতে থাকে।

লোকটি বিছানায় শোয়ে শোয়েই জয় বাংলা, জয় বাংলা বলতে থাকেন। ফলে তরুণের দলও চলে যায়। ওই রাতে যতোবার তার কড়া নড়ে, ততোবার তিনি চোখ বন্ধ রেখেই আধ-খোলা মুখে জয় বাংলা বলে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়েন।

কিন্তু ওই রাতটি ছিলো পঁচিশে মার্চের কালো রাত।

ওই রাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের তাড়া করে ফিরছিলো। সেনাবাহিনী শহরজুড়ে তল্লাশীর পাশাপাশি আক্রমন চালাচ্ছিলো। সর্বত্র অবিরাম গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো। আর এমন একটি রাতেই লোকটি পরপর পাঁচ রাত নির্ঘুম কাটিয়ে একটু ঘুমুনোর চেষ্টা করছিলেন।

শেষ রাতের দিকে লোকটির দরোজার কড়া আবারও নড়ে উঠে।

জয় বাংলা, তিনি ভেতর থেকে চিৎকার করে বলেন।

বাইরে অপেক্ষমান সেনাদল বিস্মিত হয়। তারা আবারও দরোজার কড়া নাড়ে।

-জয় বাংলা।

সেনাদের দলনেতা সজোরে দরোজার কড়া নেড়ে বলে, দরোজা খোল, খোল বলছি।

লোকটার তখন ঘুমে অর্ধ-চেতন অবস্থা। তিনি বলেন- না, খোলব না- জ্য বাংলা, জয় বাংলা।

দলনেতা সেনাদের একজনকে ইশারা করে। সেনাটি বন্দুকের এক ঘায়ে জানালার শার্সি ভেঙ্গে বন্দুকের নলটি ভেতরে তাক করে দ্রুত একরাশ গুলি ছোঁড়ে।

লোকটির দেহ এক মূহুর্তের জন্যে লাফিয়ে উঠে এবং অনন্ত ঘুমে তলিয়ে যায়।

যুদ্ধ

ভাইকুম মুহাম্মদ বশীর

[ভাইকুম মুহাম্মদ বশীর। সব্যসাচী ভারতীয় লেখক। ব্রিটিশ ভারতের দীর্ঘকাল কারা-নির্যাতিত স্বাধীনতা-সংগ্রামী। উপন্যাসিক, ছোটগল্পকার। সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারসহ নিজ দেশের অধিকাংশ সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত। পরলোকগত। 'If war is to end' শিরোনামে মূল মালয়ালম থেকে ইংরেজিতে অনুদিত ছোটগল্পটির বঙ্গানুবাদ পত্রস্থ করা হলো এখানে।]

-যুদ্ধ বন্ধ করতে হলে----। আরামদায়ক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে সুঠাম দেহের লোকটি বিড়বিড় করে বলেন। একজন বিখ্যাত লেখক ও চিন্তাবিদ তিনি। বেশ বদ-মেজাজি মানুষ হিসেবেও পরিচিতি রয়েছে তাঁর। ত্বকে চুলকানির রোগে ভোগছেন তিনি। মনের সুখে ত্বক চুলকোতে চুলকোতে দাঁতে দাঁত চেপে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়েন তিনি। সাক্ষাৎকার নিতে আসা তরুণ সাংবাদিককে তিনি জিজ্ঞেস করেন:

- যুদ্ধ বন্ধ করা নিয়ে আমার কী যেনো করতে হবে বলছিলে তুমি?

- এ নিয়ে আপনার কিছু করতে হবে না, স্যার। আমরা এ ব্যাপারে আপনার মতামতটুকুই জানতে চাইছি শুধু। যুদ্ধ বন্ধে আম-জনতার করণীয় কী হওয়া উচিত? সাংবাদিক বলেন।

-কিছুই করার নেই এখানে। ভালোই ভালোই কেটে পড়ো তুমি। বোকা!

- স্যার, একটা কিছু তো বলতেই হবে আপনার। বিশ্ব-পরিস্থিতি খুবই খারাপ। ধ্বংসযজ্ঞ চলছে সবখানে। এসব বন্ধ হওয়া উচিত অচিরেই। আমাদের শান্তি ও কল্যাণ অর্জন করতেই হবে। আর এ নিয়েই আমরা আপনার মূল্যবান পরামর্শ আশা করছি। যুদ্ধ বন্ধ করতে হলে----?

- ওরে বোকার হদ্দ, ওরা আমার কথাতেই যুদ্ধে জড়িয়েছে নাকি? যুদ্ধ-বিগ্রহ তো প্রাচীনকাল থেকেই লেগে আছে। এখনকার মতো যুদ্ধ শেষ হলেও আবারও যুদ্ধ বাধবে অচিরেই। যাও তুমি!

- হায়! এখনও যথেষ্ঠ হয়নি? আর কোন যুদ্ধ তো কাম্য নয় মোটেই। যুদ্ধের ভয়াবহতা চিরদিনের মতো বন্ধ করতে হলে----?

- যাও তো ভাই, অন্যদের জিজ্ঞেস করো গিয়ে। বিরক্ত করো না।

- আমরা অন্য সবার মতামত নিয়েছি। আমরা তো আপনার রগচটা স্বভাব সম্পর্কে জানিই। সেজন্যে সবার শেষে আপনার কাছেই এসেছি। আমাদের বিশ্বাস, অন্যদের চেয়ে আপনার মতামতের গুরুত্ব ঢের বেশি।

- অন্যদের মতামত কী? যুদ্ধ বন্ধ করতে হলে-----?

- পৃথিবীর মানুষকে যরোরুস্ত্রের ধর্ম পালন করতে হবে, কনফুসিয়াসের নীতি অবলম্বন করতে হবে, শ্রী কৃষ্ণের বাঁশরী সঙ্গীত শ্রবণে মনোনিবেশ করতে হবে, বুদ্ধের, যীশুর, মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করে নিতে হবে। নানক তো সত্য পথের দিশা দিয়েই গেছেন ইত্যাদি।

- ও, তাই নাকি? অন্য কেউ বললো না আর কিছু? রগচটা মানুষটি মজাসে চুলকোতে চুলকোতে জিজ্ঞেস করেন।

- হ্যাঁ, বলেছেন। একদল বলেছেন, যুদ্ধ বন্ধ করতে হলে বিশ্ববাসীকে সাম্যবাদে দীক্ষিত হতে হবে। আরেকদল বলেছেন, এজন্যে আমাদের নৈরাজ্যবাদের ভক্ত হতে হবে। এক পন্ডিত তো এমনও বলেছেন যে, ফ্যাসিবাদই একমাত্র ভরসা। আবার আরেকজন বলেছেন, অহিংসার নীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে আমাদের। তো, স্যার, আপনি কী বলেন- যুদ্ধ বন্ধ করতে হলে?

- তোমার তো আমাকে এ যুগের নবী বলে মানতে হবে তাহলে!

- আমি মেনে নেবো। কিন্তু অন্য কেউ কি তা মানবেন?

- তুমিই অন্যদের মেনে নিতে রাজি করাবে। তোমার পত্রিকায় খবর ছাপিয়ে দাও! ঘোষণা করে দাও যে, তুমিই আমার প্রথম শিষ্য!

- কিন্তু স্যার, আপনার কাছে কি স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ জাতীয় কিছু নাযিল হয়েছে?

- তা না তো কি? বড় বড় চোখ করে, বিকৃত মুখে সশব্দে চুলকোতে চুলকোতে লেখক বলেন।

লেখকের বসার ভঙ্গি দেখে সাংবাদিকের মনে হয়, মানুষটি পুরো বিশ্বকেই বিস্মৃত হয়ে আছেন। সাংবাদিকের গলা পরিষ্কার করে নেবার শব্দে লেখক তার দিকে তাকিয়ে বলেন:

- বেকুব কোথাকার! এখনও যাওনি তুমি?

- না স্যার। বিশ্ববাসীর প্রতি আপনার বক্তব্য আমাকে এখনও জানাননি। যুদ্ধ বন্ধ করতে হলে---

- আমার অনুমান- গোপন কথাটি জানাই আছে তোমার- নিজের বউ-বাচ্চাদের আচ্ছাসে পেটালেই হয়। দেখো তো দেখি, আমার বউ-বাচ্চাদের শেষ বার পেটানোর পর বছর দেড়েক কেটে গেছে এরই মধ্যে। ভুলে গিয়েছিলাম আসলে। হ্যাঁ, কোন কিছু ভুলে গেলে যা হয় আর কি!

- কী বলছেন, স্যার? দেড় বছর যাবত ভুলে যাচ্ছেন সবকিছু?

- আরে না, বোকা! পরমানন্দ! পরমানন্দ!

- বুঝতে পারছি না।

- বলছি। গত দেড় বছরে আমি কি কোন সম্পাদক-প্রকাশকের গায়ে হাত তুলেছি?

- না।

- গত দেড় বছরে আমার নতুন কোন বই প্রকাশিত হয়েছে?

- না।

- গত দেড় বছরে আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি মামলা হয়েছে?

- সে রকম কিছু শুনিনি।

- কেনো? বোকা, কেনো?

- জানি না।

- কারণটি অনুসন্ধান করোনি কেনো? আমি কি সাংবাদিকদের অনুসন্ধানের জন্যে উপযুক্ত নই?

- হ্যাঁ, আমার পত্রিকার ভুল হয়ে গেছে। আমাদের মাফ করুণ, স্যার। যুদ্ধ বন্ধ করতে হলে-----

- প্রার্থনা করো গিয়ে।

- কিন্তু মানুষ তো চিরকালই প্রার্থনা করে এসেছে। তবুও তো যুদ্ধ বন্ধ হয়নি। আপনার কাছে প্রেরিত প্রত্যাদেশে এ নিয়ে কী আছে তা আমাদের জানান, দয়া করে। যুদ্ধ বন্ধ করতে হলে---

- চোখ থাকতে অন্ধ, কান থাকতে বধির তোমরা। বেকুব, যাও এখান থেকে।

- কিন্তু এ তো যথেষ্ঠ নয়, স্যার। আমরা সত্যিই আপনার পরামর্শের অপেক্ষায় আছি। যুদ্ধ বন্ধ করতে হলে----

- যুদ্ধ যদি বন্ধ না হয় আদৌ? কার কী এসে যায় তাতে? তোমাদের পত্রিকার কাটতি কি কমে যাবে?

-না।

- আমার বইগুলোর বিক্রি কি কমে যাবে?

- না।

- তো, এখন যেতে পারো তুমি।

- কিন্তু! আপনার পরামর্শ চাই যে আমাদের। পৃথিবীর ভবিষ্যত শান্তি ও কল্যাণ আপনার পরামর্শের উপরই নির্ভর করছে।যুদ্ধ বন্ধ করতে হলে----?

লেখক বেশ আনন্দ ও স্বস্তি নিয়ে সশব্দে চুলকোতে থাকেন। অবশেষে তিনি বলেন:

- যুদ্ধ বন্ধ করতে হলে, আজকের দুনিয়ার সব রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতার, সব চিন্তাবিদের, সশস্ত্র বাহিনীর সব সদস্যের অর্থাৎ দুনিয়ার তাবৎ নারী-পুরুষেরই আমার মতো ত্বকে চুলকানির রোগে ভোগতে হবে। দিন-রাত চুলকানি হয়, এমন চর্মরোগে আক্রান্ত হতে হবে সবার।

ঘৃণা

বামা

[বামা।ভারতীয়।দলিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি।শ্রেণী বৈষম্যে জর্জরিত ভারতীয় সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির দুঃখ-গাঁথা নিয়ে লিখেছেন।লিখে চলেছেন।অকৃতদার।তবে বেশ ক'টা কালোত্তীর্ণ উপন্যাস আর ছোটগল্প সংকলনের জননী।স্বীকৃতি-সম্মাননাও কম পাননি।মূলতঃ তামিল ভাষার লেখিকা।পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ভাষাসমূহে তাঁর সাহিত্য-সম্ভার অনুদিত।এখানে তাঁর "Scorn" শিরোনামে ইংরেজিতে অনুদিত ছোটগল্পটির বঙ্গানুবাদ পত্রস্থ করা হলো। এই গল্পে এক ছোট্ট শিশুর জীবনের করুণ এক ঘটনার আশ্রয়ে শ্রেণি-বৈষম্যের এক অতি জঘন্য রুপ উপস্থাপিত হয়েছে।]

-আমি আজ স্কুলে যাবো না, আম্মু।আমি তোমার সাথে পাহাড়ে যাবো। চিন্নাপুন্নু মাকে উদ্দেশ্য করে বলে।

- কী বললি? চপ্পল দিয়ে পিটিয়ে একেবারে সোজা করে দেবো, বুঝেছিস?স্কুলে যাবি না কেনো? তুই পাহাড়ে গিয়ে কী করবি? সারাক্ষণ বকবক করা ছাড়া তো কিছু শিখিসনি। পরিপূর্ণম উত্তেজিত কন্ঠে বলেন।

চিন্নাপুন্নু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবারও একই কথার পুনরাবৃত্তি করে। এবারে চিন্নাপুন্নু কেঁদে ফেলে।

-যাবি না কেনো, বল? মাষ্টার তোকে মেরেছে? অন্য ছেলেমেয়েদের কেউ? আমাকে বল, মামণি। আমার তো দেরি হয়ে যাচ্ছে। দেরিতে পৌঁছলে ওরা আমাকে কাজ করতে দেবে না।

- আমি আর পড়তে চাই না। আমি বরং বাড়িতেই থাকবো। বাড়ির দেখাশোনা করবো। আমি স্কুলে যাবো না। আমার ভয় করে। আমি যেতে চাই না। কান্নারত মেয়েটি বলে।

-শোন, শোন। অনেক কস্টে খেয়ে,না-খেয়ে আমি তোদের পড়াচ্ছি।ঝামেলা পাকাসনে। স্কুলে যা। তোর বাবা এখন বাড়ি এলে তোর পিঠের চামড়া তুলে নেবে। হ্যাঁ, মনে রাখিস। পরিপূর্ণম মেয়েকে সতর্ক করে দেন।

চিন্নাপুন্নু কী করবে ভেবে পায় না। তবে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ- কিছুতেই স্কুলে যাবে না।

-মা, আমি স্কুলে যাবো না। শুধু আজ একদিন। কাল থেকে আবার স্কুলে যাবো। বাবাকে বলে দিওনা, প্লীজ।

-এতোদিন তো নিয়মিতই স্কুলে গেছিস। হঠাৎ কী হলো, আজ? পড়ালেখা করলে তোর ভবিষ্যতটা উজ্জ্বল হবে। না হলে সারা জীবন কুকুরের মতো ধুকে ধুকে মরবি।আয়, এই টাকাটা নে-কিছু একটা কিনে খেয়ে নিস। এখন ব্যাগটা নিয়ে স্কুলের পথ ধর গে, যা।পরিপূর্ণম নিজের হাতে মেয়ের গালে গড়িয়ে পড়া অশ্রু মুছে দেন।

-আমি টাকা চাই না। স্কুলে যাবো না আমি!

চিন্নাপুন্নু টাকাটা ছুঁড়ে ফেলে আবারও কাঁদতে থাকে।

পরিপূর্ণম খেয়াল করেন, চিন্নাপুন্নুর সহপাঠী কীত্তানাম্মাল স্কুলের দিকে হেঁটে যাচ্ছে।

তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে ডাক দেন- এই যে, মা। আমার মেয়েকেও তোর সাথে স্কুলে নিয়ে যা।আমার হয়েছে মরণ দশা!কোনমতেই কথা শুনছে না।

-চাচী, মন্দির পাড়ার ছেলেমেয়েরা গতকাল তোমার মেয়েকে মেরেছে। সেজন্যেই সে যেতে চাচ্ছে না। কিত্তানাম্মাল জানায়।

-ওহ, তা-ই বলো। সে তো এ নিয়ে কিচ্ছুটি বলেনি আমাকে।

-গতকাল সে দুপুরের খাবার খেতে বাসন নিয়ে যায়নি।তাই সে মন্দির পাড়ার জ্যোতিলক্ষীর কাছ থেকে বাসনটা ধার নিতে চেয়েছিলো। এতেই ঘটনাটা ঘটে।

-তুই কি ওর কাছে বাসন চেয়েছিলি? পরিপূর্ণম মেয়েকে জিজ্ঞেস করেন।

-হ্যাঁ। কিন্তু সে দেয়নি। পরে মুনিয়াম্মা আর আমি একই বাসন থেকে খেয়েছি।

-এর জন্য ওরা তোকে মারলো কেনো? পরিপূর্ণম কিছু বুঝে উঠতে পারেন না।

-না, চাচী। সে তো অন্য পাড়ার ছেলেমেয়েদের কাছে বাসন চেয়েছে। কীত্তানাম্মাল জোর দিয়ে বলে।

-ওদের কাছে বাসন চাইতে গেলি কেনো? তোর স্কুলে তো আমাদের পাড়ার ছেলেমেয়ে কম নেই। ওদের কাছে না চেয়ে অন্য পাড়ার ছেলেমেয়েদের কাছে চাইলি কেনো?

-আমাদের পাড়ার সবাই তখন খাচ্ছিলো। ও পাড়ার ওরা তো বাড়ি থেকেই বাসনসুদ্ধ খাবার নিয়ে আসে। জ্যোতিলক্ষীর খাওয়া শেষ হলে ওর খালি বাসনটি চেয়েছিলাম।চিন্নাপুন্নু মাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে।

পরিপূর্ণম মেয়ের সঙ্গে আর রাগ করে থাকতে পারেন না।

-বাচ্চারা তো স্কুলে এটা-ওটা আদান-প্রদান করেই। আর এ নিয়েই ওরা একে পিটিয়েছে। পরিপূর্ণম বিড়বিড় করে বলেন। এরপর তিনি মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

- ওরা যখন তোকে পেটালো, তখন মাস্টারের কাছে নালিশ করলি না কেনো?

-বলেছিলাম তো আমরা। কিন্তু উনি তো উল্টো চিন্নাপুন্নুকেই ধরে পিটুনি দিলেন আবারও। কিত্তানাম্মাল বলে।

-কেনো? কী বললেন তোদের মাস্টার?

- আমাদের পাড়ার মেয়ের কাছে বাসন চাইলি কেনো, তোর নিজের পাড়ার কারও কাছে চাইতে পারলি না, উনি বললেন।

-ওঁরা বাচ্চাদের কী শেখাচ্ছেন এসব? স্কুলের মাস্টাররাও বর্ণভেদের অপরাধে লিপ্ত হচ্ছেন! এ দেশের হাল যে কী হবে। পরিপূর্ণম অসহায় বোধ করেন।

পরিপূর্ণম মেয়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেন:

- স্কুলের ব্যাগ নিয়ে আয়। আজ কাজ পাই, না পাই, তাতে কী? আমি তোর সাথে স্কুলে যাবো। দেখি, হচ্ছেটা কী ওখানে। তোকে এমনভাবে মেরেছে যে, স্কুলেই যেতে চাইছিস না। তিনি মেয়ের হাত ধরে স্কুলের দিকে রওয়ানা হন।

পরিপূর্ণম চতুর্থ শ্রেণির কক্ষে যান। চিন্নাপুন্নু ওই শ্রেণিতেই পড়ে। বাচ্চারা তাকে জানায়, ওই শিক্ষক বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষেই বসে আছেন। তিনি সেদিকে ছুটেন। মায়ের সাথে চিন্নাপুন্নুও যায়। প্রধান শিক্ষকসহ অন্য শিক্ষকরা অফিস কক্ষে বসে আছেন। পরিপূর্ণম তখন খুব রেগে থাকলেও রাগ সংবরণ করে কোমল কন্ঠে বলেন:

- স্যার, শিশুরা নিজেদের মধ্যে কত কিছুই তো দেয়া-নেয়া করে। এতো তুচ্ছ একটি ব্যাপার নিয়ে আপনার পাড়ার ছেলেমেয়েরা আমার মেয়েকে মেরেছে। ও তো আর স্কুলেই আসতে চাইছে না।

চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষক চিন্নাপুন্নুর দিকে তাকান একবার। এরপর প্রধান শিক্ষককে কী যেনো বলেন। প্রধান শিক্ষক পরিপূর্ণমকে জিজ্ঞেস করেন:

- এতো তুচ্ছ একটি বিষয় নিয়ে এতোদূর এসেছিস তুই? দোষটা তো তোর মেয়েরই। গাধা দেয়ালের ছায়ায় ঘুমিয়ে প্রাসাদের স্বপ্ন দেখে! তোর মেয়ে যদি আমাদের পাড়ার ছেলেমেয়েদের জিনিসপত্র ছুঁয় আর ওগুলো দিয়ে খায়, তবে আমাদের পাড়ার শিশুরা খায় কী করে, বল? কী, সমাজের নিয়ম-কানুন জানিসনে নাকি কিছু! তোর মেয়েকে নিয়ম-কানুন না শিখিয়ে বরং বিচার চাইতে এসেছিস এখানে?

- স্যার, এই ছোট মেয়েটি জানলেও আর কদ্দুর জানবে? ও তো জানে না যে, আপনাদের পাড়ার ছেলেমেয়েদের কাছে কোন কিছু চাইতে নেই। এজন্যে ওকে মারা উচিত হয়নি। ওরা যদি সবাই একই স্কুলে পড়ে তো এ জাতীয় ঘটনা ঘটবেই।

- এজন্যেই তো তোদের পাড়ার ছেলেমেয়েদের আমরা ভর্তি করতে চাইনি। কিন্তু পরে দয়া করেই ভর্তি করিয়েছিলাম। কিন্তু দেখ তো, কীসব সমস্যা তৈরি করছিস এখন। তোদের তো নিজ জায়গাতেই থাকা উচিত। তোর মেয়ে যদি স্কুলে আসতে না চায়, তো চারটে শূকর-ছানা কিনে দেয় গে। সে ওগুলোর দেখাশোনা করুক। এতে তোর জন্যেও ভালো হবে। এখন যা। সকাল সকাল আমাদের সময় নষ্ট করিস না। এই বলে প্রধান শিক্ষক উঠে দাঁড়ালেন। অন্য শিক্ষকরাও তাঁর পেছন পেছন বেরিয়ে গেলেন। পরিপূর্ণমও মেয়ের হাত ধরে বাড়ি ফেরেন।

পরিপূর্ণম স্বামীকে ঘটনার কথা জানালে তিনি রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেন:

- আমাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে না যেতে বলার উনি কে? স্কুলটি কি উনার বাবার সম্পত্তি? আমাদের পাড়ার বাচ্চারা ওই স্কুলে না গেলে তো উনার চাকুরিই থাকবে না। আমরা এদের খুব বেশি লাই দিয়ে দিয়ে

মাথায় তুলেছি। প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে সব শিক্ষকই ওই পাড়ার। আমাদের পাড়ার দুয়েকজন পড়াশোনা করে শিক্ষক হলেও ওরা এদের মোকাবেলা করতে পারে না। ওদেরকে মিথ্যা অভিযোগ বদলি করে দেয়া হয়। এই ঘটনাটি কিছু না করে এভাবে ছেড়ে দিলে, এই চোরগুলো আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে।

- আমরা এতোটা বছর যেনো চাহিবামাত্র সবকিছু পেয়ে এসেছি আর কি। তুমি এখন গিয়ে চোখের পলকে সবকিছু ঠিক করে দেবে, এই তো? বড় বড় কথা বাদ দিয়ে বরং মেয়েকে স্কুলে যেতে রাজি করাও। নইলে ওর পড়ালেখারই ক্ষতি হবে। পরিপূর্নম বলেন।

- এদের কাছে পড়তে গেলে আমাদের বাচ্চাগুলোর ভবিষ্যতই বরবাদ হয়ে যাবে। আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো শুধু-ওদের কী হাল করি, দেখো। আমাদের বাচ্চাদের গায়ে হাত তুলতে দেবো না ওদের।

- থামো তো। তুমি ওখানে গিয়ে যা ইচ্ছে বলতে পারো। কিন্তু ওরা মেয়েটাকে পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেবে। এভাবে কতোজনকে যে এরা ফেল করিয়ে দিয়েছে, জানো কিছু? ওরা সবাই ভালো ছাত্র-ছাত্রীই ছিলো। না, বাদ দাও এসব।

পরদিন চিন্নাপুন্নুকে ওই পাড়ার ছেলেমেয়েদের সাথে কথা বলতে বা ওদের কাছে কিছু না চাইতে নিষেধ করে দেন তার মা-বাবা। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে মেয়েকে স্কুলে দিয়ে আসেন। চিন্নাপুন্নু শ্রেণিকক্ষে মনমরা হয়ে বসে থাকে। আগের মতো কিছুই ভালো লাগে না, পড়ায় মন বসে না তার। ওই পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কেনো কথা বলতে পারবে না, বুঝতে পারে না সে।

এরপর বেশ ক'দিন ধরে চিন্নাপুন্নুর ঘটনা নিয়ে আলোচনা চলে বস্তিতে। ওরা ওই পাড়ার ছেলেমেয়েদের আচরণ নিয়ে খুব হৈচৈ না করলেও বাচ্চাদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের আচরণ মেনে নিতে পারেন না। সান্ধ্যকালীন বৈঠকে জোর আলোচনা চলে এ নিয়ে। এমনকি, কাঠুরিয়া মহিলা ও অন্যান্য মহিলারা এ নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠেন:

- এ স্কুলে পড়ার চেয়ে বাড়িতে বসে থাকাই বরং ভালো। আমার মেয়েও তা-ই বলে। পুরো স্কুলটি আমাদের বাচ্চারাই ঝাড় দেয়। আর ওদের বাচ্চারা কেবল স্কুলে আসে, ক্লাস করে ও কোন কিছুতে হাত না লাগিয়েই বাড়ি ফেরে।

- শুধু আমাদের বাচ্চারাই কেনো ঝাড় দেবে? ওরা কাজটি করতে রাজি না হলেই তো হয়।

- আরে না। ওরা তো কোন কিছু না করতে চাইলেই পিটুনি খায়। আমার স্বামী একদিন স্কুলে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো। মাস্টাররা নাকি বলেছে, আমাদের বাচ্চারা ঝাড় দেয়ার কাজটি ভালো পারে আর ওদের বাচ্চারা কাজটি মোটেও জানে না। ফলে আমাদের বাচ্চাদেরই কাজটি করতে হয়।

- দারুণ! আমাদের বাচ্চারা পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব পালন করবে আর ওরা পড়ালেখা করবে। ঠিক আমরা যেমন পাহাড়ে খেটে মরছি আর ওরা মজা লুটছে।

- কিন্তু জানো তো, আমাদের ছেলেরা মুখিয়ে উঠছে? কতোদিন আর এসব সহ্য করবে ওরা? আমরা নিজেরা পিছিয়ে আছি। কিন্তু আমাদের বাচ্চারা নিজের পায়ে দাঁড়াক আর উন্নতি করুক, তা-ই চাই। শুধু আমরা কেনো, সবার হৃদয়ে এই বাসনাই দাবানলের মতো জ্বলছে।

- হক কথা। এ রকম বহু ঘটনাই ঘটে চলেছে। ছোটরা শ্রেণিকক্ষকে ময়লা করে ফেললে আমাদের বাচ্চাদেরই তা পরিষ্কার করতে হয়। এতোটা জুলুমবাজ ওরা।

এর তিন-চার সপ্তাহ পরে আরেকটি ঘটনা ঘটে। তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষিকা কমলাভাল্লি উৎসব বোনাসসহ তার ব্যাগটি স্কুল ছুটির সময় খুঁযে না পাওয়ায় ওই ক্লাসের বস্তিবাসী সব শিশুকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভেল্লুকানানের ছেলে কান্তারিই টাকাটা চুরি করেছে। ওরা কান্তারিকে স্কুলে আটকে রেখে বস্তিবাসী অন্য শিশুদের ছেড়ে দেন।

খবরটা দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ে। কান্তারির মা কাঁদতে কাঁদতে স্কুলে ছুটে যান। পাড়ার সর্দারকে নিয়ে ভেল্লুকানানও স্কুলে গিয়ে পৌঁছেন। পাড়ার আরও দশ-পনেরো জন লোক স্কুলে গিয়ে হাজির হন। প্রধান শিক্ষকও খবর দিয়ে তার পাড়ার সর্দার ও দশ জন গণ্যমান্য লোক নিয়ে আসেন। শিশু কান্তারি ভয়ে কাঁপতে থাকে। প্রচন্ড অসহায় দেখায় তাকে।

প্রধান শিক্ষক বিচারের কার্যক্রম শুরু করেন।

- তোমাদের পাড়ার এই ছেলেটি কী কান্ড করেছে, দেখো। ছোট হলে কী হবে, তিন হাজার টাকা মেরে দিয়েছে সে! তোমরা যদি আমাদের সর্দারের কথা মানো, তাহলে সমস্যাটি এখানে সমাধান করা যাবে। নইলে পুলিশ ডাকতে বাধ্য হবো।

বস্তির সর্দার কুট্টিয়ান বলেন:

- তৃতীয় শ্রেণির কক্ষেই যদি টাকাটা হারানো গিয়ে থাকে, তাহলে তো ওই শ্রেণির সব শিশুকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত। তা না করে শুধু বস্তির ছেলেমেয়েদেরই কেনো জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন? এটা তো ঠিক না।

- কী বলছিস? আমাদের পাড়ার ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে বলছিস? ওই পাড়ার সর্দার উত্তেজিত কন্ঠে বলেন।

- হ্যাঁ, তা-ই বলছি। আপনাদের ছেলেমেয়েরা কি চুরি করতে পারে না? আমাদের পাড়ার ছেলেমেয়েরাই চুরি করে শুধু? কুট্টিয়ান জিজ্ঞেস করেন।

- এই, কী বললি? তোর সাহস তো কম না, তুই আমাদের ছেলেমেয়েদের চোর বলছিস? ওই পাড়ার সর্দার চিৎকার করে বলেন। তিনি বসা অবস্থা থেকে উঠে কুট্টিয়ানকে মারতে শুরু করেন।

-উনি অন্যায় কী বলেছেন? ক্লাসের সব শিশুকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত ছিলো আপনাদের। আপনারা আমার ছেলেকে আটকে রেখে চুরির অপবাদ দিয়েছেন।কীভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন? সে বস্তিবাসী দরিদ্র পিতার সন্তান, এজন্যেই কি? ভেল্লুকানান বলেন। তিনি ছেলের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেন:

- তুই কি টাকাটা চুরি করেছিস?

- না, বাবা। আমি টাকা নিইনি। আমি যখন শৌচাগারে যাই, তখন অরবিন্দের কাছে অনেকগুলো টাকা দেখেছি। সে তো এক প্যাকেট বিস্কুটও কিনে খেয়েছে।

- দেখুন, সে তো কোন এক অরবিন্দের কথা বলছে।ওই ছেলেটি সম্পর্কে খোঁজ নিন।

ভেল্লুকানান এই কথা বলার সাথে সাথে ওই পাড়ার সর্দার উচ্চস্বরে বলতে থাকেন:

- কত বড় দু:সাহস তোর! তুই কি বলতে চাইছিস যে, আমার ছেলেই চুরি করেছে? তুই কি মনে করছিস, আমার ছেলেও তোদের পাড়ার ছেলেদের মতো বদমাশ? আমার ছেলে চোর? এই বলে ওই পাড়ার সর্দার ভেল্লুকানানকেও মারতে শুরু করেন।

কান্তারি দৌঁড়ে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। এরই মধ্যে একজন শিক্ষক এসে প্রধান শিক্ষককে কানে কানে কী যেনো বলেন। এরপর প্রধান শিক্ষক তার পাড়ার সর্দারকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

- বাদ দিন তো। কুকুর মেরে পাপের ভাগিদার হবেন কেনো? এদের তো কোন কিছু বলতে নেই। গায়ে গা লাগলেও তো এরা ঝগড়া করতে আসে। এরা এখন আর আগের মতো নেই। বাদ দিন।

- বাদ দেবো কেনো? ও কী বলেছে,শুনেছো?

- এর কথায় আপনার মান যাবে না। এই যে, ছেলেকে নিয়ে বাড়ি যা। ব্যাপারটা এখানেই শেষ করে দিই, চল। ওই শিক্ষিকা টাকাটা ফেরত পেয়েছে। ভাগ্য ভালো, কারও উপর দোষ চাপলো না। প্রধান শিক্ষক সহজ ভঙ্গিতে বলেন।

ভেল্লুকানানের রাগের কোন সীমা থাকে না। গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে মাটিতে থুতু ছিটোন তিনি। এরপর কান্তারিকে কাঁধে তুলে নিয়ে ঝড়ের বেগে প্রস্থান করেন ওখান থেকে। কুট্টিয়ানসহ অন্যরাও অনুসরণ করেন তাকে।

মায়ের চাকুরি

দীপক শর্মা

[দীপক শর্মা বিখ্যাত ভারতীয় নারীবাদী লেখিকা। জন্ম ১৯৪৬ সালে। হিন্দী ভাষার এই লেখিকার বারোটি ছোটগল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে এ পর্যন্ত। লক্ষ্ণৌয়ের এক কলেজে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে সার্বক্ষণিকভাবে লেখালেখিতে জড়িত। এখানে পত্রস্থ তাঁর ছোটগল্পটি মূল হিন্দী থেকে ইংরেজিতে ভাষান্তর করেছেন অনুবাদক ধীরাজ সিং।]

বাবা কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফিরতেই বড় কাকী খবরটি দেন তাঁকে:

- একজনকে চাকুরিতে নেবে ওরা। মহিলাই নেবে---- কাপড়ের কারখানাটায়। সকালের শিফটে। সকাল সাতটা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত কর্মঘন্টা। বেতনটাও ভালো। তিন হাজার টাকা। চাকুরিটা কার্তিকির জন্যে উপযুক্ত------।

- কার্তিকির জন্যে? ওই শ্বাস-যন্ত্রটার জন্যে? বাবা বিদ্রুপাত্বক বিস্ময়ে বলেন।

বাবা মায়ের জন্যে একেক সময় একেক নাম উদ্ভাবন করেন। কখনও কখনও মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যাটি নিয়ে আফসোসও করেন। মা দীর্ঘদিন ধরে এজমায় ভোগছেন। কিন্তু তাই বলে বাড়িতে হাত গুটিয়ে বসেও থাকেননি তিনি। বরং পুরো এলাকার মানুষের কাপড় সেলাইয়ের কাজে ব্যস্ত থাকেন। ফলে কখন যে তাঁর জোরে জোরে শ্বাস নেবার শব্দ শুনছি আর কবে তাঁর কক্ষ থেকে সেলাই মেশিনের শব্দ ভেসে আসছে বুঝতে পারি না। রাতের বেলা মাঝেমধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসে তাঁর কষ্টটা টের পাই। তাই মা কবে যে শেষ নিশ্বাসটিই ত্যাগ করে বসেন-এ ভয়টি তাড়া করে আমাকে।

- কার্তিকির জন্যে না তো কার জন্যে আর? চাকুরিটা করার মতো সময় আমার আছে বলে মনে হয় তোমার? বড় কাকী মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যাটার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে বলেন।

বড় কাকী আমাদের বাড়ির অবিসংবাদিত রাণী। গত সতের বছর ধরে। নববধূ হয়ে তিনি এ বাড়িতে এসেছিলেন- কারণ, আমার দাদু আমার বড় কাকুর বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বড় কাকুর বয়স তখন মাত্র তেইশ বছর। ওই সময়ে বড় কাকু বিয়ের পিঁড়িতে বসার চিন্তা বাদ দিয়ে বরং হন্যে হয়ে একটা চাকুরিই খুঁজছিলেন। কিন্তু এর কিছুদিন আগে দাদীমা মারা যাওয়ায় দাদু বাড়িতে একজন মহিলা থাকা দরকার বলে মত দিচ্ছিলেন বারবার। যেনো ওই মহিলা বাড়ির পুরুষ মানুষগুলোর দেখভাল করতে পারেন। তাছাড়া, তাঁর পনের বছর বয়সের মেয়েটিও মানসিক রোগে ভোগছিলেন। এ অবস্থায় অন্তত: রান্না ঘরের দায়িত্ব নেবার জন্যে হলেও তো একজন মহিলা দরকার। কিন্তু দু:খের বিষয়, দাদু বড় কাকীর রান্না বেশিদিন উপভোগ করতে পারেননি। বড় কাকীর এ বাড়িতে আগমনের দেড় বছরের মাথায় তিনি মারা যান। এর বছর চারেক পরে বড় কাকুও মৃত্যুবরণ করেন।

- ওর কাজটা কী হবে ওখানে? বাবা জানতে চান।

- তুলো ধোয়ার কাজ। বড় কাকী বলেন।

- তাহলে মাকে এ ধরণের কাজের ধারে-কাছেও ঘেঁষতে দেয়া যাবে না। কারণ, তুলো ধোয়ার কাজ তো তরল ক্লোরিণ দিয়ে করা হয়। এটি এজমা রোগীদের জন্যে বিপদজনক---। আমি আর না বলে থাকতে পারি না। ব্যাপারটি আমার অষ্টম শ্রেণির রসায়ন বিজ্ঞানের বই থেকে জানতে পেরেছিলাম।

- যেনো সবজান্তা একজন আর কি! তুই কি জানিস, দু'মুঠো খাবার যোগাড় করাও কতোটা কঠিন ইদানিং? পাঁচ জনের খাবার যোগাতে হচ্ছে মাত্র একজনকে----।

আমি বাবার সঙ্গে তর্কে জড়াতে চাই না।তাই চুপ করে থাকি। একবার মনে হয়, বলেই ফেলি যে, শিক্ষকতা করে শুধু বাবাই উপার্জন করছেন না, পাশাপাশি মায়ের সেলাইয়ের কাজ থেকেও ঘরে দুটো পয়সা আসে।

মায়ের স্বাস্থ্যের প্রতি আমি ছাড়া আর কারও খেয়াল নেই। বাবা আর তাঁর মানসিক রোগাক্রান্ত বোন মাকে তেমন পছন্দ করেন না। বড় কাকীর সঙ্গে ওদের ভাবসাব যে রকম, তাতে ওদের কাছে মায়ের কদর ঘরের আসবাবপত্রের চেয়ে বেশি কিছু নয়। কিন্তু মায়ের সঙ্গে বড় কাকীর দহরম-মহরম সম্পর্ক। মায়ের মতে, এর কারণ হলো, বড় কাকী জানেন, তিনি বাবার উপর কতোটা নির্ভরশীল।

- আমি যাবো ওখানে কাজ করতে। ওই চাকুরিটা করতে কোন সমস্যা হবে না আমার।সেলাইয়ের ঘর থেকে গলা চড়িয়ে মা বলেন।

বড় কাকী আর মা পরস্পর দূর সম্পর্কের বোন। আসলে বড় কাকীই বাবা ও মায়ের মধ্যে বিয়েটা দিয়েছিলেন। তেরো বছর আগে, বড় কাকুর মৃত্যুর পরে।

- আমি নিজে গিয়ে কথা বলে আসবো ওদের সঙ্গে- কখন কাজে যোগ দিতে পারবে, দেখি। বাবা বলেন।

মা এর পরদিনই ওই কাপড়ের কারখানায় কাজে যোগ দেন। এ কারণে সকাল বেলা মায়ের সঙ্গে আমার এখন আর দেখা হয় না। মাকে ছাড়া সকালগুলো কেমন যেনো নীরব- নিস্তব্ধ বলে মনে হয়। যেমনটি তাঁর সেলাইয়ের মেশিনটিও নীরবে পড়ে আছে। বিকেল তিনটার পরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রচন্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েন মা। সেলাই মেশিনে কাজ করা বা একটু বসে আমার সঙ্গে দুটো কথা বলার মতো অবস্থা তাঁর থাকে না। এ কারণে মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যাটিও যেনো বিদায় নিয়েছে আমাদের জীবন থেকে। একই কারণে মা আর আমার মধ্যে দূরত্বটাও যেনো বেড়েই চলেছে। আমি অনুভব করতে শুরু করি, মা আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন-আসন্ন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছেন। মাঝেমধ্যে ঘুমেও দু:স্বপ্ন দেখি-মায়ের মৃতদেহ পড়ে আছে বা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছেন তিনি।

একদিন বিরতির পরেই আমাদের স্কুল ছুটি হয়ে যায়। স্কুলের ঘন্টা-বাজানো বুড়োটি আকস্মিক মারা যান। উঁচুমতো যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে রোজ ঘন্টা বাজাতেন, সেখান থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। যুগপৎ শোক ও রাগের মিশেলে শ্রেণি শিক্ষক খবরটা জানান আমাদের:

- গত দুই বছর ধরেই অসুস্থ ছিলো বুড়োটা। কতো করে বললাম- অবসর নাও, অবসর নাও। কিন্তু শোনলো না- রোজকার মতো স্কুলে এসে হাজির। আরও বলে কিনা, কোন অসুবিধা নেই, কাজ চালিয়ে নিতে পারবে---ঘন্টা বাজানো নাকি নাক চুলকানোর মতোই সহজ কাজ।

চাকুরি করতে গিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন মা। একদিন মাকে দেখার জন্যে ওই কারখানায় যেতে সিদ্ধান্ত নিই। কারখানায় পৌঁছে জানতে পারি, মা মহিলা কর্মীদের সঙ্গে বড় কক্ষটায় কাজ করছেন।

আমি ভেতরে ঢুকে পড়ি।বড়সড় একটি কক্ষকে দুই অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশে বড় বড় তুলোর পিন্ড থেকে সুতো তৈরি করা হচ্ছে। আর দ্বিতীয় অংশে সুতোগুলো থেকে মোটা মোটা কাপড়ের থান বানানো হচ্ছে।

আরেকটি বড় কক্ষে প্রবেশ করতেই ক্লোরিনের তীব্র গন্ধ এসে লাগে নাকে। চোখ দুটো জ্বালা করে ও অশ্রুতে টলমল করে উঠে। গন্ধটা সয়ে উঠতেই বুঝতে পারি, বাষ্পটা বর্গাকৃতির একটি পাকা গর্ত থেকে আসছে যেখানে তাজা তুলো চুবানো হচ্ছে। এই কক্ষটিতে কেবল মহিলারাই কাজ করছেন। এদের কেউ কেউ ডাক্তার বা সেবিকাদের মতো মুখে মুখোশ পরে আছেন। মুখোশের আড়ালে মুখ-ঢাকা এই মহিলাদের মধ্যে আমি মাকে খুঁজতে থাকি। আরেকটু ভালোভাবে খোঁজার জন্যে আমি কক্ষটার এক কোণে গিয়ে দাঁড়াই। দেখি, মা কক্ষটার অন্য প্রান্তে একদল মহিলার সঙ্গে ধোয়ার জন্যে তুলো খোলার কাজ করছেন। আমি তাঁকে পরণের শাড়ি দেখেই চিনতে পারি, মুখ দেখে নয়। কারণ, তাঁর মুখটি মুখোশে ঢাকা। ওখানে ওই অবস্থায় মাকে দেখে একেবারেই অচেনা কেউ বলে মনে হয় আমার। গোটা দুনিয়াকে বিস্মৃত হয়ে হাতের কাজটিতে মগ্ন হয়ে আছেন মা। তুলোর যে গাঁটটি খুলছেন তাতেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। মুখের পেশীগুলো কুঞ্চিত হয়ে আছে। যেনো কাউকে আক্রমণে উদ্যত হয়েছেন তিনি। যেনো কাপড় আর তাঁর মাঝখানে যে-ই এসে দাঁড়াক, তাকেই তিনি আক্রমণ করে বসবেন।

আমি তাঁর দিকে এগিয়ে যাই। তবে তিনি আমার উপস্থিতি টের পান না।

- তুমি বড্ড বেশি হাসছো, কার্তিকি।কর্তৃত্বময় কন্ঠে এক মহিলা বলেন।

মা হাসেন। একটু পরেই হাসিটা আরও জোরালো হয়ে উঠে। মাকে আর কখনও ওভাবে হাসতে দেখিনি। হয়তো বা এই হাসিটুকু তিনি চাপা দিয়ে রেখেছিলেন এতোদিন। আর এখন শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই তাঁর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে তা।

- তাড়াতাড়ি করো, হাত লাগাও। আরও জোরে। মনোযোগ দিয়ে কাজ করো। দেখো, কাপড়ে কোন ভাঁজ যেনো না থাকে। আজই এগুলো পাঠাতে হবে-----। ওই মহিলা আবারও বলেন।

- ঈশ্বর, সহায় হও।

তিন শব্দের মজাদার ও গুরুতর এই শব্দগুচ্ছটি আমার চেনা। মা-ই এ রকম বলেন। তাঁর প্রকাশভঙ্গী এমনই- দিনে বহুবার এ কথাটি উচ্চারণ করেন তিনি---বিশেষ করে যখন বাবা তাঁকে বকাঝকা করেন বা তাঁর মানসিক রোগাক্রান্ত বোন মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করেন কিংবা বড় কাকী যখন মাকে একের পর এক উপদেশ বিলোন তখন।

- ঈশ্বরকে কার সহায় হতে বলছো? ওই হিটলারি মহিলার? মায়ের পাশে-বসা এক মহিলা জিজ্ঞেস করেন।

- ঈশ্বর সবার সহায় হোন। কেবল কার্তিকির জা ছাড়া। ওই রাক্ষসীটা দেবরের সঙ্গে লটর-পটর করার জন্যে নিজের স্বামীকে পরপারে পাঠিয়ে কার্তিকির জীবনটাও ছারখার করে দিয়েছে। আরেকজন মহিলা বলে উঠেন।

- কিন্তু এখন আর ওই অবস্থা নেই। ওই নরকটা আমার নয় আর। ওটা এখন ওরই। আমি আমার স্বর্গ খুঁজে পেয়েছি। এখানেই। মা হেসে বলেন।

অদ্ভূদ এক অনুভূতি আমাকে ঘিরে ধরে। দ্বিধাগ্রস্থ আমি মায়ের দিকে আর এগোতে পারি না। শ্বাসকষ্টে-ভোগা যে মাকে আমি সারা জীবন দেখে এসেছি, তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানুষ বলেই মনে হয় তাঁকে। সে মুহূর্তে মা আমাকে দেখতে না পেলেও আমি তাঁর জীবনের এমন একটা অনুষঙ্গ দেখতে পাই যা এর আগে আর কখনও দেখিনি।

আমি মায়ের কাছ থেকে মাত্র কয়েক কদম দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছি।

আমি ওখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে ঘুরে দাঁড়াই।কারণ, মায়ের জন্যে উদ্বিগ্ন বোধ করার দরকার নেই আর।

শয়তান

অমর জলিল

[অমর জলিল খ্যাতিমান পাকিস্তানী কথাশিল্পী। জন্ম ১৯৩৬ সালে। সিন্ধী ভাষার অন্যতম প্রধান এই লেখক উর্দু আর ইংরেজিতেও সমান পারদর্শী। করাচি বিশ্ববিদ্যালয় ও সিন্ধ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'দুবার স্নাতকোত্তর এই সাহিত্যিকের স্থায়ী নিবাস করাচিতে। হয়তো বা এ কারণে তাঁর লেখায় ঘুরেফিরে করাচির নানা প্রসঙ্গ উঠে এসেছে বারংবার। সমসাময়িক সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির অসঙ্গগতিগুলো তাঁর ছোটগল্পে সুনিপূণ মুন্সিয়ানায় চিত্রিত হয়েছে। এখানে তাঁর 'টু স্টোন স্যাটান' শীর্ষক ছোটগল্পটির বাংলা ভাষান্তর পত্রস্থ করা হলো।]

বদরু ভান্ডারি পুরনো করাচির কুখ্যাত মস্তান। সে হঠাৎ করেই নিজেকে সংশোধন করে ভদ্রলোকের মতো জীবন যাপনের কথা ভাবতে শুরু করে। বদরু ভান্ডারি কেনো যে উচ্ছৃংখল জীবনটাকে বদলাতে চাইছে তা তার বন্ধুরা কিংবা শত্রুরা বুঝে উঠতে পারে না ঠিক। ভদ্রলোক হতে চাইছে কেনো সে? দৃশ্যত: কোন কারণে ভয় পেয়েছে বলে তো মনে হয় না। ক্ষমতাধর, রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীদের সাথে তো আগের মতোই দিব্যি পানাহার ও ফুর্তিতে মজে আছে। পুলিশও উঠ-বস করে চলেছে তার কথায়। তার অধীনস্থ গুন্ডার দলটিও তো কাজ করছে ঠিকমতো। পুরনো করাচির রাস্তা দিয়ে সে গাড়ি চালিয়ে গেলে আতংকিত মায়েরা এখনও তো আগের মতো বাচ্চাদের ঘরের ভেতরে টেনে নিয়ে যান।

বদরু ভান্ডারি কেনো যে জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে চাইছে তা মস্ত বড় এক রহস্য বৈকি। তবে আম-জনতার ধারণা, একবার রাস্তায় বন্দুক যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের পালের গোদা তার ছোঁড়া গুলি থেকে অল্পের জন্যে রক্ষা পেলেও প্রতিবন্ধী এক বৃদ্ধা মাথা ও হৃৎপিন্ডে গুলিবিদ্ধ হন। গুলিতে বৃদ্ধার ভিক্ষার জন্যে বাড়িয়ে দেয়া কুঞ্চিত হাতটিও ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ফলে ধরাশায়ী হয়ে ওখানেই মৃত্যু হয় বৃদ্ধার। বদরু ভান্ডারির মনে হয়, বৃদ্ধার খোলা চোখ দুটো যেনো তার দিকে এখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

বদরু ভান্ডারির সাঙ্গপাঙ্গদের মতে, ওই ঘটনাটি তাকে প্রচন্ড নাড়িয়ে দিয়েছে। এতে হতভম্ব হয়ে পড়েছে সে। সন্ত্রাসের পথ ত্যাগ করে শান্তিপূর্ণ একটি জীবন যাপনের ব্যাপারে বন্ধুদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ শুরু করে সে। পাপ-পূণ্যের দ্বন্দ্বে তার ভেতরটা যেনো দ্বিখন্ডিত হয়ে যায়।

পাপের জীবন থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে সাহায্য চেয়ে একের পর এক জ্ঞাণী-গুণির সঙ্গে দেখা করতে থাকে সে। কিন্তু লাভ হয় না তেমন।

গুণিজনের সান্নিধ্যে মোহমুক্তির এই প্রয়াস চলাকালে কেউ একজন তাকে এক গুরুর সন্ধান দেয়। আর বলে, গুরু হয়তো বা তাকে পাপের কবল থেকে উদ্ধার করে নিতে পারবেন।

বদরু ভান্ডারি গুরুর সঙ্গে দেখা করে নিবেদন করে:

- গুরু, আমি এক জন্ম-পাপী।

- মানুষ তো নিষ্পাপ হিসেবেই জন্মগ্রহণ করে। শয়তানই মানুষকে অপরাধী করে তোলে।

- আমি নানা রকম অপরাধ আর খুনোখোনি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি অপরাধ-মুক্ত জীবন যাপন করতে চাই।

- অপরাধ-মুক্ত জীবন চাইলে তো প্রথমে শয়তানের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে হবে তোর। আর শয়তানকে পরাস্ত করতে না পারলে জীবনে শান্তির দেখাও পাবি না কোনদিন।

গুরুর কথা শুনে বিহবল হয়ে পড়ে বদরু ভান্ডারি।

গুরু তাকে জিজ্ঞেস করেন:

- শয়তানকে কোথায় খুঁজে পাবি, জানিস?

-হ্যাঁ, জানি।আমি ঠিক জানি ওকে কোথায় খুঁজতে হবে। চিরতরে ধ্বংস করে ছাড়বো ওকে।

বদরু ভান্ডারি গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসে। জরুরি পাসপোর্ট করিয়ে নেয়। প্রভাবশালী লোকজনের সহায়তায় অতি দ্রুত ওমরাহ হজ্বের জন্যে একটি ভিসাও করিয়ে নেয়।

এরপর সৌদি আরবে কয়েকটি হাত-বোমা ও একটি রকেট লঞ্চার নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে সে। কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারে, সেটি অসম্ভব। কারণ, অত দূর থেকে সৌদি আরব পর্যন্ত ওসব অস্ত্র বহন করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

মস্ত বড় গুন্ডা-সর্দার বদরু। যা ইচ্ছে তা-ই করে অভ্যেস। ফলে সৌদি আরবে অস্ত্র নিয়ে যেতে না পেরে হতাশ হয় সে। সে দুবাই আর শারজাহতে তার ঘনিষ্ঠ লোকজনের সাথে যোগাযোগ করে। তার মক্কায় অবস্থানকালে কিছু বিস্ফোরক হস্তগত করা যায় কিনা জানতে চেষ্টা করে। কিন্তু সৌদি আরবে তার কাছে বিস্ফোরক সরবরাহ করার মতো কাউকে পাওয়া যায় না দুবাইতে।

- তুমি সৌদি আরবে বিস্ফোরক নিয়ে কী করবে? ঘনিষ্ট এক বন্ধু জিজ্ঞেস করে বদরুকে।

বদরু বন্ধুর চোখে চোখ রেখে বলে:

- শয়তানকে লক্ষ্য করে নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করার চেয়ে ওকে বরং ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চাই। ওকে একেবারে শেষ করে দিতে চাই আমি।

- তুমি পাগল হয়ে গেছো,বদরু। এ রকম কিছু করতে গেলে ওরা তোমার শিরচ্ছেদ করে ছাড়বে। ভয়ার্ত কন্ঠে বন্ধু বলে।

-ওই ঝুঁকিটুকু নিতেই হবে আমার। শয়তানকে ধ্বংস করে দিতে না পারলে শান্তি পাবো না জীবনে। সে আমাকে প্রতিনিয়ত তাড়া করে ফেরে।

বদরু ভান্ডারি বিমানে চড়ে বসে। সৌদি আরব পর্যন্ত তিন ঘন্টার বিমান যাত্রায় সে খাবার বা নাস্তা-পানি- কিছুই স্পর্শ করে না। বরং শয়তানকে নির্মূল করার পরিকল্পনা সাজায় মনে মনে। চিন্তামগ্ন অবস্থায়ই গন্তব্যে পৌঁছে যায় সে। মক্কার পাঁচ-তারকা একটি হোটেলে গিয়ে উঠে।

পরদিন ওমরা হজ্ব পালনে প্রয়োজনীয় কিছু আনুষ্ঠানিকতা সেরে নেয় বদরু। এরপর দৃঢ় পায়ে ধীরে ধীরে শয়তানের প্রতীক খুঁটিটার দিকে এগোয়। ওখানে পৌঁছার পর যদ্দুর সম্ভব খুঁটিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। বড় বড় নুড়ি পাথর কুড়িয়ে শয়তানকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে থাকে সে।

পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করার অল্পক্ষণের মধ্যে বদরুকে পাগলামিতে পেয়ে বসে যেনো। গায়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে বর্বর হিংস্রতায় পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে সে। গালি-গালাজ সহকারে পাথর নিক্ষেপ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে। অবসন্ন বদরু সূর্যাস্তের পরে হোটেলে ফেরে।

পনেরো দিন যাবত শয়তানের খুঁটির পাশে গিয়ে পাথর নিক্ষেপ করে বদরু। পনেরো দিন পরে ফিরতি যাত্রায় বিমানে চড়ে বসে খুব অবসন্ন ও ক্লান্ত অনুভব করে সে।

করাচিতে ফেরার দুদিনের মাথায় বদরু একটি কাঁচা বস্তি উচ্ছেদ করে এক মন্ত্রীকে খুশি করে দেয়। মন্ত্রী ওই জায়গায় নিজেই কিছু ভবন তৈরি করে ভাড়া দিতে চান।বস্তিটা উচ্ছেদের পরে কয়েক রাত ঘুমুতে পারে না বদরু। উচ্ছেদের শিকার নারী-পুরুষ-শিশুর হৈচৈ, কান্নাকাটি তার কানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে সারাক্ষণ।

পরদিন গুরুর ডেরায় গিয়ে হাজির হয় বদরু। সে বলে:

- পনেরো দিন ধরে শয়তানকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করেছি। কিন্তু মনে হচ্ছে, কোন লাভ হয়নি তাতে।

- শয়তান তো আমাদের ভেতরেই বাস করে। তোর বরং ভেতরের শয়তানকে লক্ষ্য করেই পাথর নিক্ষেপ করা উচিত ছিলো। গুরু বলেন।

শরণার্থী ও ইউরোপ-স্বর্গ

হাসান ব্লাসিম

[হাসান ব্লাসিমের জন্ম ইরাকে। তরুণ এই লেখকের বেশ ক'টি গ্রন্থ বেরিয়েছে ইতোমধ্যে। এর সবকটিই ইংরেজিতে অনুদিত হয়েছে। এখানে তাঁর 'এ রিফুউজি ইন দি প্যারাডাইজ দেট ইস ইউরোপ' শিরোনামে ইংরেজিতে অনুদিত অণুগল্পটির বঙ্গানুবাদ পত্রস্থ করা হলো।]

তুমি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসো।

ওরা তোমাকে সীমান্তে পেটায়।

ওরা বর্ণবাদী কাগজে তোমাকে অপমানিত করে।

ওরা টেলিভিশনে তোমার সন্তানের লাশ নিয়ে বিশ্লেষণ করে।

ওরা একত্রিত হয়ে তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করে।

ওরা তোমার সলিল-সমাধির ছবি আঁকে।

ওরা তোমাকে যাদুঘরে রেখে হাততালিতে ফেটে পড়ে।

ওরা তোমাকে পেটানো বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় ও তোমাকে মোকাবেলার জন্যে একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে।

পন্ডিতেরা তোমার শরীর আর আত্মা নিয়ে গবেষণার জন্যে নতুন অনুদান পায়।

রাজনীতিকেরা তোমার ভাগ্য নির্ধারণে আয়োজিত জরুরি বৈঠকের পরে লাল মদ্য পান করে।

ওরা বনে ঠান্ডায় জমে-যাওয়া তোমার কণ্যার জন্যে করণীয় খুঁজতে গিয়ে ইতিহাস অধ্যয়ন করে।

ওরা তোমার বেদনায় কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে।

ওরা তোমার বিরুদ্ধে মিছিল বের করে ও দেয়াল তুলে।

পরিবেশবাদীরা রাস্তায় রাস্তায় তোমার ছবি টাঙ্গায়।

অন্যরা আরামদায়ক কেদারায় হেলান দিয়ে ফেসবুকে তোমার ছবির উপর ক্লান্তিকর মন্তব্য করে ঘুমুতে যায়।

ওরা ছুরার ন্যায় ধারালো ও তির্যক বিতর্কে তোমার মানবিক সত্ত্বাকে উদোম করে ছাড়ে।

ওরা কোনদিন তোমার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করলেও পরদিনই স্বার্থপরের মতো তোমাকে গায়েব করে দেয়।

ওরা তোমার মর্মন্তুদ ঘটনাবলীর অন্তরালে নিজেদের মানবিকতা সন্ধান করে।

ওরা তোমাকে নিজেদের স্বর্গে নিয়ে যায়, কিন্তু আতংকিত ওরা তোমাকে অহর্নিশ পেটায়; ভয় আর আশা যুগপৎ হাতছানি দেয়।

যাপিত দিনগুলো ঘুমিয়ে পড়ে আর তোমার অভ্যন্তরে জেগে জেগে উঠে।

সমকাল তোমাকে কুরে কুরে খায়।

তুমি সন্তান পয়দা করো আর বুড়িয়ে যাও।

তুমি মরে যাও।

শরণার্থী

পারভীন ফয়েজ যাদাহ মালাল

[পারভীন ফয়েজ যাদাহ মালাল-এর জন্ম আফগানিস্তানের কান্দাহার শহরে। ১৯৮৮ সালে আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানে হিজরত করেন। পেশোয়ার হয়ে পরে করাচিতে থিতু হন। ১৯৮৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়কালে তিনটি কবিতা সংকলন ও ১৯৯৬ সালে একটি ছোটগল্প সংকলন বেরোয় তাঁর। যেটি পরে 'White Pages' শিরোনামে ইংরেজিতেও অনুদিত হয়। এখানে পত্রস্থ ছোটগল্পটি ওই সংকলনেই অন্তর্ভূক্ত এবং মূল পশতু থেকে এর ইংরেজিতে ভাষান্তর করেছেন Anders Widmark]

-ঠিক চার কেজি হয়েছে।

কথাটি শুনে তার মুখে মৃদু হাসি ছড়িয়ে পড়ে। ছোট বাচ্চাটির দিকে তাকায় সে।

দোকানদার আবারও বলে:

-এই নাও, বোন-আট টাকা।

সে চাদরের ভেতর থেকে হাত বের করে দোকানদারের কাছ থেকে টাকাটা নেয়। এরপর বিকেলের রোদ মাড়িয়ে দ্রুত পদে নিজের তাঁবুর দিকে রওয়ানা হয়। বাচ্চাটির হাত শক্ত করে ধরে রাখে সে। এতোটা শক্ত করে যে, বাচ্চাটি হঠাৎ বলে উঠে:

-আম্মু, হাতে ব্যথা পাচ্ছি।

-তোর মা তো তোর ভালোর জন্যেই করে সবকিছু। ঠিক আছে, নরম করে ধরছি। সে আদর-ভরা কন্ঠে বলে।

নিজের প্রিয় স্বদেশ ছেড়ে আসার পর পুরো একটি বছর কেটে গেছে এরই মধ্যে; ভিন্ন এক দেশে দিনরাত হতাশায় ভোগা ও দুর্ভোগ পোহানোই তার নিয়তি এখন। প্রতিদিন ভোরবেলা সে ছেলেকে নিয়ে তাঁবু থেকে বের হয়ে শহরের বাজার ও অলিগলি ঘুরে বিকেল পর্যন্ত কাগজ কুড়োয়। সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলে সারাদিনের কুড়োনো কাগজগুলো কোন দোকানে বিক্রি করে দেয়। চার থেকে পাঁচ টাকা আয় হয় তাতে। তবে আজ সে খুব খুশি। কারণ, আট টাকা আয় হয়েছে আজ। কোন কোন দিন আবার শূন্য হাতেও ফিরতে হয় তাকে। পরিত্যক্ত কাগজগুলো দমকা হাওয়ায় উড়ে যায় কখনও কখনও। একইভাবে তার জীবনের সব সুখও যেনো হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। দূরে কোথাও, চিরতরে। কিন্তু আজ খুশি মনেই ফিরছে সে। ফিরতি পথে রুটি, চা-পাতা ও খানিকটা চিনি কেনে সে। কেনা-কাটার পরও দুই টাকা রয়ে যায় তার হাতে। কালো কালো তাঁবুর সারি পেরিয়ে অবশেষে নিজের তাঁবুতে পৌঁছোয় সে। তাঁবুর দরোজায় ঝুলানো পুরনো ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোটি সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতেই মাগরিবের আযানের আওয়াজ কানে আসে তার। ওযু করে নামায আদায় করার পর তেলের কূপিটা জ্বালাতে গিয়ে দেখে, তেল নেই একটুও। তাই ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে:

-বাবা, তেল ফুরিয়ে গেছে। এই টাকা আর বোতলটি নে। পাশের দোকানে গিয়ে কিছু তেল কিনে আন গে, যা।

ছেলে উঠে দাঁড়ায়। মায়ের হাত থেকে টাকা ও বোতলটি নিয়ে বলে:

-আম্মু, ভালো হবে------

-ভালো হবে তুই যদি পথে অন্য ছেলেদের সাথে খেলায় মেতে না উঠিস। তাড়াতাড়ি যা-আঁধার নামলো বলে।

এই কথা বলে চুলোয় উনুন ধরানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে। উনুন জ্বলে উঠে, সাথে নানারুপ চিন্তাও ঘিরে ধরে তাকে। স্মৃতিগুলোও তাকে দু:স্বপ্নের মতো তাড়া করে বেড়ায়। চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে।উনুনের শিখা বাতাসকে তপ্ত করে তোলে। ঠিক যেমনটি নির্বাসন ও দেশত্যাগের কথা ভেবে তার আহত হৃদয়টিও সর্বদা ছটফট করে আর স্বদেশে ফেরার ইচ্ছেটাও তখন প্রবল হয়ে উঠে মনে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন ওই তাঁবুতে বসে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায় কাতর হয়ে উঠে আর ফেলে আসা অতীতকে নিয়ে ভাবে সে। খুব বেশিদিন আগের কথা তো নয়। মাত্র বছর খানেক আগেই তো সব ছিলো তার-প্রেমময় স্বামী, বাড়ি, মর্যাদাপূর্ন চাকুরি আর সর্বোপরি নিজের একটি দেশ। কিন্তু এখন তো সে নি:স্বই বলতে গেলে। নিজের ছোট বাচ্চাটি তার সাথে আছে বটে। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের কী হলো, কে কোথায় আছে কিংবা ওরা আদৌ বেঁচেই আছে কিনা কে জানে। তবে তার জন্যে সবচেয়ে দু:খের বিষয় হলো, বাচ্চাটিকে পড়াশোনা করানো সম্ভব হচ্ছে না। দেশে থাকতে এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হিসেবে নিজের কাজের কথা মনে পড়ে তার। ওই বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণির দশ জন বাচ্চাকে পড়াতো সে। কিন্তু হায়, তার নিজের বাচ্চাটিই এখন নিরক্ষর। মাঝেমধ্যে বাচ্চাকে পড়াতে বসেছে সে। তবে বাচ্চাটিকে কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে পড়ানোই তার একান্ত ইচ্ছে; কিন্তু সে তো হবার নয়। তাঁবুতে বসে ওই বিদ্যালয়ে নিজের শিক্ষার্থীদের কথা ভাবতে গিয়ে তার কষ্টটা সামান্য লাঘব হয়। কারণ, এক বেদনা অন্য বেদনাকে যেনো চাপা দেয়। ভবিষ্যতকে ঘিরে মনের কোণে এক-আধটু স্বপ্নও জেগে উঠে তখন।

অন্য দিনের মতো আজ সকালে তাঁবুর বাইরে আসতেই ঠান্ডা হাওয়া গায়ে লাগে তার। আকাশে মেঘের ঘনঘটার সাথে দুয়েক ফোঁটা বৃষ্টিরও দেখা মেলে। মেঘের ঘনঘটা বাড়তেই উদ্বিগ্ন বোধ করতে শুরু করে সে। বৃষ্টির দিনে বেশি দূরে কোথাও যাওয়া যায় না আর মূষলধারে বৃষ্টি হলে তো পরিত্যক্ত কাগজগুলো ভিজে একাকার হয়ে যায়। তারা দ্রুত পায়ে বাজারের দিকে অগ্রসর হয়। বাজারের কাছাকাছি পৌঁছোতেই বৃষ্টির পরিমাণ বেড়ে যায়। তারা বন্ধ এক দোকানের সামনের বারান্দায় গিয়ে আশ্রয় নেয় ; বাচ্চাটি মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। বৃষ্টি কমার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে তারা। ঘন্টা খানেক পরে বৃষ্টি থামে। তারা রাস্তায় নেমে শহরের অলিগলিতে শুকনো কাগজ খুঁজতে শুরু করে। সকাল গড়িয়ে বিকেল হয়, কিন্তু শুকনো কাগজের দেখা মেলে না। দুপুরে খাওয়া হয় না কিছুই। কারণ, আগের দিন যা আয় হয়েছিলো, তার সবই খরচ হয়ে গেছে। বিকেল আরেকটু গড়াতেই বাচ্চাটি ক্ষুধার্ত বোধ করে। এর আগেও বছরজুড়ে বহুবার না খেয়ে থাকতে হয়েছে তাদের। এর মধ্যে বেশিরভাগ দিনই আগের দিনের আয়ের কোন টাকা অবশিষ্ট ছিলো না। ফলে সকালে এক কাপ চা পান করেই বিকেল পর্যন্ত কাটাতে হয়েছে। সারাদিন অভূক্ত থেকে কাগজ বিক্রি করে সন্ধ্যেবেলা তাঁবুতে ফিরেই সামান্য খাবার জুটেছে ভাগ্যে। বাচ্চাটিকে এতে অভ্যস্ত করে তুলেছে সে। তবে বাচ্চাটি আজ অল্পতেই ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছে আর নিয়মটিও মানতে চাইছে না। বারবার শুধু

ক্ষিদের কথাই বলছে।বাচ্চাকে স্বান্তনা দিতে ও বুঝাতে চেষ্টা করে সে। কিন্তু এতে কাজ হয় না। ফলে সে কী যে করবে ভেবে পায় না। কার কাছে যে যাবে, কোন দোকানে গিয়ে বাকীতে খাবার চাইবে কিংবা কোন পথচারীর সাহায্য চাইবে-কিচ্ছুটি ঢুকে না তার মাথায়। এসব করতে তো বেশ সাহসের দরকার পড়ে। খুব সাহসী হলেও এমনটি করতে চাইবে না কেউ। আর সে যখন এ নিয়ে কল্পনাও করতে পারে না, তখন বাস্তবে এরকম করার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু বাচ্চাটির অবস্থা আজ অন্য দিনের চেয়ে করুণ। কোন দোকানে গিয়ে খাবার চাইবার ও কোন পথচারীর কাছে হাত পাতার কথা বেশ ক'বার ভেবেছে সে। কিন্তু সেরকমটি করে উঠতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। ওই মূহুর্তে আরেকটি ধারণা আসে তার মাথায়- কারও বাড়িতে গিয়ে যদি খাবার চাওয়া যায়। অন্তত: এ কাজটি করা সম্ভব হতে পারে তার পক্ষে। কারণ, কারও দরোজায় করাঘাত করলে খুব সম্ভবত: কোন মহিলা এসেই দরোজা খুলবেন। যে চিন্তা সে কাজ। ছেলেকে নিয়ে একটি বাড়ির দিকে এগোয় সে।

বাড়িটির দিকে এগোতে গিয়ে তার শরীরে কাঁপুনি ধরে যায়। ঘামতে থাকে সে। বাড়িটির দরোজায় পৌঁছোনোর পরে কড়া নাড়বে কি,নাড়বে না- এ নিয়ে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। একদিকে সন্তানের জন্যে স্নেহ ও মমতা, আবার অন্যদিকে লজ্জা ও ভয়। তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। অবশেষে দরোজার কড়ার দিকে হাত বাড়িয়েই দেয় সে। একটু পরে এক বৃদ্ধা এসে দরোজা খুলেন। কম্পিত কন্ঠে বৃদ্ধাকে উদ্দেশ্য করে সে বলে:

-আমার বাচ্চা----বাচ্চাটি খুবই ক্ষুধার্ত আর পয়সা-কড়িও নেই আমার কাছে, যদি----

সে বাক্যটি শেষ করতে পারে না। তার আগেই বৃদ্ধা ঘুরে দাঁড়িয়ে বাড়ির ভেতরের দিকে যেতে যেতে বলেন:

-এ বাড়িটিকে নিজের বাড়ি বলেই মনে করো।

আধ-খোলা দরোজা দিয়ে সে দেখতে পায়, বৃদ্ধা ফিরে আসছেন। তার এক হাতে খাবারের একটি পাত্র আর অন্য হাতে কিছু রুটি। ওই মূহুর্তে বাড়ির ভেতর থেকে এক তরুণির কন্ঠ ভেসে আসে তার কানে:

-মা, আমি তোমাকে কতোবার বলেছি, ওগুলো কুকুরকে খেতে দিও, শরণার্থীদের নয়------

হাতে খাবারের পাত্রটি নিয়ে দরোজায় পৌঁছে বৃদ্ধা দেখেন, ওই মহিলা ও তার বাচ্চাটি চলে গেছে। বৃদ্ধা আধ-খোলা দরোজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে ডানে-বামে তাকিয়ে দেখতে পান, ওরা ততোক্ষণে গলিটার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে।